

সালাফদের ফরিয়াদ

(সাহাবি, তাবেয়ি, তাবে-তাবেয়িগণ যেভাবে দুআ করতেন)

মূল | শাইখ ওমর সুলেইমান
ভাষান্তর | নাবিলা আফরোজ জান্নাত



ভূমিকা

মুহাম্মাদ আল মুখতার আল শিনকিতি (রহ.) ছিলেন একজন প্রাজ্ঞ আলিম। তিনি একটি মূল্যবান কথা বলেছিলেন—

‘মানুষ আজকাল আল্লাহর ব্যাপারে এতটাই অজ্ঞতার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, তারা জানেই না—তঁাকে কীভাবে ডাকতে হয়, কেমন করে রবের সাথে নিজের ব্যক্তিগত আলাপ সারতে হয়।’

ব্যক্তিগত দুআ বা মোনাজাত আসলে কেমন হওয়া সমীচীন? উত্তরে আমরা বলব—আপনার দুআ ছন্দময় বা শ্রুতিমধুর কি না, তা আল্লাহর নিকট মোটেই বিবেচ্য নয়। এমনকী আপনি যে ভাষায় প্রার্থনা করছেন, তা-ও আলাদা কোনো গুরুত্ব বহন করে না; বরং প্রধান বিষয় হলো—আল্লাহর কাছে চাওয়ার ব্যাপারে আপনি কতটা ব্যাকুল ও আন্তরিক, হৃদয়ের কতটা গভীর থেকে কথাগুলো উৎসারিত হচ্ছে।

ইমাম আহমাদ (রহ.)-কে একবার আল্লাহ থেকে বান্দার দূরত্ব সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন—

‘একটা বিশুদ্ধ হৃদয় থেকে উৎসারিত আন্তরিক দুআ।

এটাই হচ্ছে আল্লাহর সাথে যোগাযোগের উত্তম উপায়।’

নবিদের জীবন থেকে প্রাপ্ত এবং কুরআনে বর্ণিত দুআগুলোই সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রার্থনাবাক্য। রাসূল ﷺ আমাদের শিখিয়ে গেছেন—কেমন করে আল্লাহর সাথে হৃদয় খুলে ব্যক্তিগত মিনতি পেশ করতে হয়। অনুরূপ অজস্র দৃষ্টান্তের দেখা মেলে সাহাবিদের জীবনে। তাঁদের জিন্দেগি ছিল আল্লাহর প্রতি অবিচল ইয়াকিন, অপরিসীম আস্থা এবং অনন্য উপায়ে আরাধনার চমৎকার উদাহরণ।

সূচিপত্র

| | |
|----|----------------------------------|
| ১১ | সুন্দরে সমাপন |
| ১৪ | দরজা তাঁর রুদ্ধ থাকে না কভু |
| ১৭ | খোদার সাথে চুক্তি |
| ১৯ | অগণিত পাপ আর অফুরান ক্ষমা |
| ২২ | মৃত্যু লিখো মদিনাতে |
| ২৫ | বেহেশতে চাই নবির সঙ্গ |
| ৩০ | জানোই তো প্রভু, কতটা বেসেছি ভালো |
| ৩৩ | এক বৃদ্ধা মাতার মিনতি |
| ৩৮ | নফসের মোহ |
| ৪১ | ঝঞ্ঝার চেয়ে তীব্র সে দুআ |
| ৪৪ | দণ্ড দিয়ো না প্রভু |
| ৪৬ | আমাকে করো না পাপের নমুনা |
| ৪৯ | পরখ বিনেই তোহফা মাগি |
| ৫১ | অধমকে দাও দয়ার পরশ |
| ৫৪ | বৃক্ষের ফরিয়াদ |

| | |
|----|-----------------------------------|
| ৫৫ | তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ |
| ৫৮ | যে দুআয় মুখ্ফ রাসূল ﷺ |
| ৬১ | চেতনায় থাক বিষাদের দাগ |
| ৬৪ | অধিকতর সুন্দর করো, উজ্জ্বল করো হে |
| ৬৬ | সবর নহে, প্রার্থনা করো মুক্তি |
| ৬৯ | ফজরেই হোক যবনিকাপাত |
| ৭১ | পূর্ণ তুমি নিখুঁত আলোয় |
| ৭৩ | অনুরাগ তব সৃষ্টিকূলে |
| ৭৫ | আবৃত করো তোমার চাদরে |
| ৭৭ | হে ইবরাহিমের শিক্ষক |
| ৭৯ | তুমি রহমান, দীনতা আমারই |
| ৮১ | নিজেই সঁপেছি তোমারই দুয়ারে |
| ৮৩ | আমাকে শামিল করো ঋদ্ধজনের কাতারে |
| ৮৫ | অন্তর মম নন্দিত করো |
| ৮৭ | দেখাও তোমার সত্য পথ |

এক

সুন্দরে সমাপন

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ زَمَانِيْ اٰخِرَةً، وَخَيْرَ اَيَّامِيْ يَوْمَ الْقَاٰكِ-

‘হে আল্লাহ! আমার জীবনের শেষ মুহূর্তকে সর্বোৎকৃষ্ট সময় বানিয়ে দিন এবং শেষ আমলকে করে দিন সর্বোত্তম আমল। আর সেই দিনকে করুন আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়, যেদিন আপনার সাথে সাক্ষাৎ হবে।’

আমাদের পূর্ববর্তী রাহবার অর্থাৎ সালাফগণের দুআয় জীবনের শেষ সময়ের কথা উল্লেখ থাকত। মহান আল্লাহর কাছে তাঁদের একনিষ্ঠ প্রার্থনা ছিল, জীবনের শেষ সময়গুলো যেন হয় বাকি সময়ের থেকে অধিকতর সুন্দর।

আবু বকর (রা.) তাঁর জীবদ্দশায় সব সময় নবিজির পাশে থেকেছেন। পারলে নবিজির জন্য নিজের জীবন দিতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। মৃত্যুর পরও তাঁর শেষশয্যা হয়েছে রাসূল ﷺ-এর কবর মোবারকের পাশে। এই মহান সঙ্গীকে নিয়ে নবিজি একবার বলেছিলেন—

‘আবু বকর আমার পাশাপাশি জান্নাতে প্রবেশ করবে।’

আবু বকর (রা.)-এর ইন্তেকাল ছিল অসাধারণ। নবিজি সপ্তাহের যেই দিনে, যেই বয়সে চলে যান, আবু বকর (রা.)ও ঠিক একই দিনে, একই বয়সে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করেন। দুজনেই পেয়েছিলেন তেষটি বছরের সংক্ষিপ্ত অথচ কর্মমুখর জিন্দেগি। নবিজির আরও দুই প্রিয়তম সাহাবি উমর এবং আলি (রা.) ও একই বয়সে ইন্তেকাল করেন। জীবনের শেষ সময়ে আবু বকর (রা.) এমনকী পোশাক-পরিচ্ছদও পরতেন নবিজির আদলে। আর নিয়মিত দুআ করতেন—

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ زَمَانِيْ اٰخِرَةً-

‘হে আল্লাহ! আমার জীবনের শেষ সময়গুলো যেন সবচেয়ে সুন্দর সময় হয়।’

একবার চিন্তা করুন আবু বকর (রা.)-এর বরকতময় জীবনপ্রবাহের কথা। ইসলামের একেবারে প্রথম যুগে তিনি রাসূল ﷺ-এর সান্নিধ্যে থাকার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। তিনি ছিলেন নবিজির

প্রাণ-প্রিয় বন্ধু, বিশ্বস্ত সহচর। পুরুষদের মধ্যে নবিজি তাঁকেই ভালোবাসতেন সবচেয়ে বেশি। শুধু তাই না; দুনিয়াতেই যারা জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছিলেন, তাদের মধ্যে আবু বকর (রা.) ছিলেন অন্যতম। এক জীবনে কত মর্যাদাই না তিনি পেয়েছিলেন! কী বরকতময় ছিল তাঁর জীবন! অথচ এতকিছুর অধিকারী হয়েও তিনি চেয়েছেন, জীবনের শেষ সময়টাই যেন হয় সবথেকে সুন্দর। তিনি আরও বলতেন—

وَحَيَّرَ عَلَيَّ خَوَاتِمَهُ-

‘আমার জীবনের শেষ আমল যেন সর্বোত্তম আমল হয়।’

ভাবুন তো, সাহাবিদের মধ্যে আর কার আমল আবু বকর (রা.)-এর মতো হতে পারে? জীবনের প্রত্যেক পরতে পরতে তিনি এমনসব আমলে পরিপূর্ণ ছিলেন, অন্যান্য সাহাবিদের জন্য চিরকাল যা ছিল অনতিক্রম্য। তারপরও তিনি মহান আল্লাহর কাছে তাঁর শেষ আমলটাই সর্বোত্তম মর্যাদায় কবুলিয়াতের প্রার্থনা করেছেন। দুআ শেষ করেছেন এভাবে—

وَحَيَّرَ أَيَّامِي يَوْمَ الْقَاكِ-

‘আমার জীবনের সেরা সময় যেন হয় সেই দিন, যেদিন সাক্ষাৎ হবে আপনার সাথে।’

এটি দারুণ শক্তিশালী ও মনোমুগ্ধকর এক দুআ, যা আবু বকর (রা.) নিজে আমল করতেন। মৃত্যুর সময় এই জান্নাতি সাহাবিই প্রখ্যাত পয়গম্বর ইউসুফ عليه السلام-এর শেখানো ভাষায় বলে উঠলেন—

تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ-

‘আমাকে ইসলামের ওপর মৃত্যু দান করুন আর মিলিত করুন স্বজনদের সাথে।’ সূরা ইউসুফ :

দুই

দরজা তাঁর রুদ্ধ থাকে না কভু

إِلَهِى غَارَتِ النُّجُومُ، وَنَامَتِ الْعُيُونُ وَغَلَقَتِ الْمُلُوكُ أَبْوَابَهَا، وَبَابُكَ مَفْتُوحٌ، وَخَلَا كُلُّ حَبِيبٍ بِحَبِيبِهِ، وَهَذَا مَقَامِي بَيْنَ يَدَيْكَ-

‘হে আল্লাহ! তারাগুলো নিভে গেছে, চোখগুলো নিমগ্ন নিদ্রায়। আর বাদশাহরা বন্ধ করেছে দরবার। কিন্তু তোমার দরজা তো খোলা প্রভু। প্রত্যেক প্রেমিক নির্জনে মিলিত হয়েছে তার প্রেমিকার সাথে; অথচ এখানে একান্তে আমি শুধু তোমারই সামনে দাঁড়িয়ে।’

এটি পুণ্যবতী তাবায়ি হাবিবা আল আদাবিয়া (রহ.)-এর একান্ত ব্যক্তিগত দুআ। তিনি ছিলেন খোদাভীরু নারী, আমাদের পূর্ববর্তী নেককার বান্দাদের একজন। আবদুল্লাহ আল মাক্কিসহ আরও কয়েকজন বর্ণনা করেছেন—


‘রাত্রির মধ্যভাগে যখন খুব অন্ধকার, তখন হাবিবা আল আদাবিয়া (রহ.) আল্লাহর সান্নিধ্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে নামাজে দাঁড়িয়ে যেতেন। রবের সঙ্গে কথা বলতেন এই সব শক্তিশালী অর্থবহুল বাক্যে। আর এভাবে নামাজ ও দুআর মধ্য দিয়েই রাত পেরিয়ে ভোর হয়ে যেত। তিনি বলতেন—

“হে আল্লাহ! রাত পেরিয়ে দিনের আলো ক্রমশ উজ্জ্বল হচ্ছে। আমার জানতে ইচ্ছা হয়, তুমি কি কবুল করেছ এই রাতের প্রার্থনা? যদি করতে, আমি অভিনন্দন জানাতাম নিজেকে; আর নয়তো দিতাম সান্ত্বনা। হে আল্লাহ! তোমার ইজ্জতের কসম! যতদিন বাঁচিয়ে রাখো, এ দৃঢ় শপথ আমার—

শত ভর্ৎসনাতেও মুখ ফেরাব না তোমার দরজা থেকে। হে মালিক! তোমার দয়া আর রহমত ছাড়া কিছুতেই যে পূর্ণ হয় না প্রাণ!”

হাফিজ ইবনে রজব বলেছিলেন—

‘তুমি দিনেরবেলায় রাজা-বাদশাহদের দরজায় ঘুরঘুর করো। আর রাতেরবেলা সমস্ত বাদশাহের বাদশাহ যখন ডাকে, তখন তুমি সাড়া দিতে পারো না; অথচ তিনি ডেকে ডেকে তোমাকে দিতে চান।’

দুআটিতে আল্লাহর প্রতি ভয় এবং বান্দার ডাকে তাঁর সাড়া দেওয়ার আশাবাদ সমন্বিত কথোপকথনের মাধ্যমে চমৎকার রূপ পেয়েছে। ঠিক যেমন আমাদের পিতা ইবরাহিম  ও তাঁর পুত্র কাবা ঘর নির্মাণের পর তা কবুল করে নেওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করেছিলেন।

একইভাবে হাবিবা আল আদাবিয়া (রহ.) আল্লাহকে বলছেন, আল্লাহ তাঁর দুআ কবুল করে নিলে তিনি খুশি হবেন। আর যদি প্রার্থনা কবুল না হয়, তাহলে তিনি ভেঙে পড়বেন না; বরং সান্ত্বনা দেবেন নিজেকে, আর লাগাতার চেষ্টায় রত থাকবেন অহর্নিশ। আল্লাহর দরজা থেকে কেউ তাঁকে সরিয়ে নিতে পারবে না। কেননা, আল্লাহর ভালোবাসা ও দয়া ছাড়া কোনো কিছুই তাঁর হৃদয়কে পূর্ণ করতে পারে না।

আল্লাহর কাছে ব্যক্তিগত কিছু চাওয়ার পর আমরা হয়তো বলি—‘হুম! দুআ তো করেছি।’ তারপর ভীষণ আত্মতুষ্ট হয়ে, এক বুক আশা নিয়ে বসে থাকি; কোনো এক দৈব ঘটনায় হঠাৎ বদলে যাবে সমগ্র জীবন। কিন্তু পরদিন যখন দুআর বিপরীতে কিছু ঘটতে দেখি, আমরা ভেবে নিই—এটা মনে হয় দুআ কবুল না হওয়ার ইঙ্গিত! আর ঠিক তখনই আমরা মহান রবের কাছ থেকে বহু দূরে সরে যাই; অথচ দুআ কবুল হয়েছে কি না—এই দুনিয়ায় কখনোই তা নিশ্চিতভাবে জানা সম্ভব নয়।

আল আদাবিয়া (রহ.)-এর দুআ এই কারণেই অসাধারণ। প্রতিটা রাতই তাঁর কাছে প্রভুর দরজায় লুটিয়ে পড়ার আরেকটি অনন্য সুযোগ। ফলে কখনোই তিনি হাল ছাড়েননি; বরং প্রাণপণ দুআয় হৃদয়কে রেখেছেন নিরন্তর ব্যস্ত।

নয়

নফসের মোহ

اللَّهُمَّ قِنِّي شَحَّ نَفْسِي-

‘হে আল্লাহ! আমাকে মুক্তি দিন আত্মার লালসা হতে।’

ইবরাহিম عليه السلام-কে বলা হতো সিদ্দিক তথা সৎ বা সত্যবাদী। তিনি নিয়মিত আল্লাহর কাছে দুআ করতেন কপটতা থেকে নিরাপদ থাকতে। আর জগতের সমস্ত নারীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভদ্র এবং শালীন ছিলেন মারইয়াম عليها السلام। তিনি অমার্জিত আচরণকে সবথেকে বেশি ভয় করতেন। আল্লাহর কাছে পানাহ চাইতেন যাবতীয় অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা থেকে। সৎ উপাধি পাওয়ার পরও তাঁরা উভয়ই অসদাচরণের আশঙ্কায় ভীত। মুমিনের দৃষ্টান্ত তো এমনই, সর্বাপেক্ষা শালীন হয়েও অশালীন কার্যকলাপ থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে অহর্নিশ।

অতীতের মহান ব্যক্তিদের মধ্যে কিছু ব্যাপার ছিল, যা আমাদের সাধারণ চিন্তায় সহজে বোধগম্য নয়। আমরা বুঝে উঠতে পারি না; তাঁরা ঠিক কেন এমন করেন, ভাবেন বা বলেন। উঁচু স্তরের আমল আর পাপ থেকে নিরাপদ দূরত্বে থেকেও তারা শঙ্কিত হয়ে পড়েন তাকওয়া ও পরহেজগারিতা হ্রাসের আশঙ্কায়।

রাসূল ﷺ-এর সবচেয়ে ধনী সাহাবিদের একজন ছিলেন আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.)। যেমন তাঁর ধনের প্রাচুর্য ছিল, তেমনি ছিল দানের ঐশ্বর্য। মদিনায় তাঁর উটের কাফেলা হেঁটে যাওয়ার সময় মনে হতো, কোনো শত্রুদল বুঝি হানা দিলো! সেই তিনিই কাবা তাওয়াফের সময় দুআ করতেন—

‘হে আল্লাহ! আমাকে হৃদয়ের প্রলোভন থেকে মুক্ত করুন।’

একদিন ইবনে আওফ একে একে সাত বার কাবা প্রদক্ষিণ করে শুধু এই একই দুআ করে যাচ্ছেন; অন্য কিছুই আর চাইছেন না। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো—

‘শুধু এই দুআই কেন করছেন?’

তিনি বললেন—

‘যদি আমি আত্মার লোভ থেকে নিরাপদ থাকি, তাহলে হয়তো চুরি, যিনা আর অন্যান্য পাপ থেকেও দূরে থাকব।’

আত্মার লোভ ব্যাপারটা কেমন

যখন মানুষের ধন-সম্পদ অনেক বেশি বেড়ে যায়, তখন সে স্বাভাবিকভাবেই লোভী হয়ে ওঠে। তার মধ্যে এই ভাবনা কাজ করতে শুরু করে যে, অন্যকে সাহায্য বা দান করলে আমার সম্পদ কমে যাবে। এভাবে অত্যধিক সম্পদের লোভে সে হয়ে ওঠে বেপরোয়া ও দুর্নীতিবাজ। আবার সম্পদ কম থাকলেই যে মানুষ চুরি করে—তা কিন্তু সব সময় সত্য নয়। বিপুল সম্পদের মালিকও লোভী হতে পারে। সীমাহীন লোভ তখন ঈমান-আমল-আখলাক সবকিছুই ধ্বংস করে দেয়।

রাসূল ﷺ বলেন—

‘আদমসন্তানকে যদি একটি স্বর্ণভর্তি উপত্যকাও দিয়ে দেওয়া হয়, তবুও সে আরেকটা চাইবে। যদি দুটো দেওয়া হয়, তো সে তিনটা দাবি করবে। কবরের মাটি ছাড়া আর কিছুই তার মুখ ভরাতে পারবে না।’

মাত্রাতিরিক্ত প্রাপ্তি মানুষের মাথা ঘুরিয়ে দেয়। ফলে সে কেবল আকাঙ্ক্ষাই করতে থাকে। আমরা এখানে কোনো অসহায় কিংবা দুস্থ লোকের লোভের কথা আলোচনা করছি না; বরং বলছি অতুল্য লোভী ধনীদেব কথা। তারা কেন এমন করে? কেননা, অনেক থাকার পরও তাদের মাথায় আরও বিচিত্র চাহিদার কথা অনবরত ঘুরতে থাকে। নিজেদের তারা সর্বদা অভাবগ্রস্ত মনে করে; যদিও তা অদৌ সত্য নয়। এটাই হচ্ছে মনের লোভ, নফসের লাগামহীন চাহিদা।

দশ

ঝঞ্ঝার চেয়ে তীব্র সে দুআ

أَرَيْنَا قُدْرَتَكَ فَأَرِنَا عَفْوَكَ-

‘যেভাবে আপনার শক্তিমত্তা প্রদর্শন করেছেন, একইভাবে আমাদের প্রতি ক্ষমার নজির স্থাপন করুন।’

আপনার জীবনে এমন পরিস্থিতি কি এসেছে? মনে হচ্ছে—প্রচণ্ড অসহায়, চারপাশে সব এলোমেলো, কিছুই করার নেই।

অথবা ধরুন, নদী বা সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছেন। এমন সময় তীব্র ঝড়-ঝঞ্ঝার তোড়ে সব ভেঙে চুরমার হওয়ার দশা। চোখের সামনে ক্রমশ ধেয়ে আসছে নিশ্চিত মৃত্যু। ঢের বুঝতে পারছেন, এই তীব্র ঢেউ মোকাবিলার সাধ্য আপনার নেই। জীবনের এমন অসহায় মুহূর্তগুলোতেই আমরা গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারি, আল্লাহ ব্যতীত কোনো চূড়ান্ত আশ্রয় নেই। তাঁর সাহায্য ছাড়া আমরা নিতান্ত দুর্বল আর অসহায়। তাঁর সামান্যতম ইশারাতে মুহূর্তেই তছনছ হয়ে যেতে পারে আমাদের জীবন। কেননা, আল্লাহ হচ্ছেন আকবার এবং সর্বাপেক্ষা প্রতাপশালী। আবার তিনিই দয়া ও মমতার অনিঃশেষ ভান্ডার, সবচেয়ে মহান ও ক্ষমাশীল। তাঁর চেয়ে অধিক বা সমপরিমাণ দয়া কেউ কোনোদিন আর ধারণ করতে পারবে না।

পৃথিবীতে ঘটে যাওয়া নির্মম ঘটনাগুলো সম্বন্ধে যখন আমরা জানতে পারি, দেখি— প্রচণ্ড ক্ষুধার যন্ত্রণায় কিংবা বোমার আঘাতে মারা যাচ্ছে শত শত নিষ্পাপ শিশু। দিকে দিকে নির্যাতিত হচ্ছে মানুষ, কিন্তু জালিম টিকে থাকছে বহাল তবিয়েতে। সন্ত্রাস, নিপীড়ন, জুলুম ও বিচরহীনতা গ্রাস করছে মাশরিক থেকে মাগরিব। ঠিক তখনই প্রশ্ন জাগে, আল্লাহ কি এসব দেখেন না? কোথায় তাঁর দয়া? অথচ ওই মুহূর্তেও আল্লাহ পরম করুণাময় ও সর্বোচ্চ ক্ষমতাবান, আসমান ও জমিনের একচ্ছত্র অধিপতি।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। চিকিৎসকের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়ার সময় একজন রোগী কী চিন্তা করে? সে তো জানে না তার কী হয়েছে। কেউ বুঝিয়ে বললে হয়তো কিছুটা ধারণা পাবে।

কিন্তু চিকিৎসক যে ওষুধ খেতে বলছেন, তার কার্যকারিতা ও প্রভাব সম্পর্কে সে তেমন কিছুই জানে না। তারপরও সে ওষুধ সেবন করে, মেনে চলে অন্যান্য পরামর্শ। অর্থাৎ, জগতের সবকিছু নিজ জ্ঞানের আওতায় এনে মানুষ জীবনযাপন করে না। আমাদের পক্ষে কখনোই পৃথিবীর সবকিছু জেনে ফেলা সম্ভব নয়। এজন্য প্রায়ই আমরা অন্যের জ্ঞানের ওপর আস্থা রেখে সুপরামর্শ মেনে নেই।

সুতরাং, যখন মনে হচ্ছে আল্লাহ রহমানুর রাহিম হওয়া সত্ত্বেও চারিদিকে কেন এত অন্যায্য? তখন আমাদের উচিত, আল্লাহর জ্ঞানের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখা। মানবীয় জ্ঞানের ওপর বিশ্বাস রাখতে পারলে তামাম দুনিয়ার সৃষ্টিকর্তার ওপর আস্থা না রেখে উপায় কী? পাশাপাশি কায়মনোবাক্যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা ও সাধের সর্বোচ্চ চেষ্টা জারি রাখতে হবে। কখনোই ভাববেন না, আপনার কৃতকর্ম আল্লাহর দৃষ্টি এবং জ্ঞানের বাইরে থেকে যাচ্ছে। বিশ্বাস হারিয়ে আমরা যেন এমন কথা কখনোই না বলি।

ইবরাহিম বিন আদহাম (রহ.) একবার জাহাজে করে কোথাও যাচ্ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন বিচক্ষণ আলিম এবং ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি। আশপাশের সবাই তাঁর ধার্মিকতার ব্যাপারে ওয়াকিবহাল ছিল। মাঝ সমুদ্রে হঠাৎ প্রলয়ংকরী ঝড় শুরু হলো। ঢেউয়ের প্রবল ধাক্কায় জাহাজ ভেঙে যায় যায় অবস্থা। ঝড়ের তীব্রতা বাড়ছে, ডানে-বামে দুলছে জাহাজ। মৃত্যুভয়ে কুণ্ঠিত জনতা ছুটে বেড়াচ্ছে দিগ্বিদিক। ইবরাহিম বিন আদহাম (রহ.) ঘুম থেকে জেগে জাহাজের ডেকে গিয়ে দাঁড়ালেন। অন্য যাত্রীরাও একে একে জমায়েত হলো তাঁর পাশে। বলল, ‘আপনি কি আল্লাহকে বলতে পারেন আমাদের এই অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে?’ তিনি আসমানের দিকে দুহাত তুলে ধরলেন—

‘হে চিরঞ্জীব! সর্বৈব ক্ষমতার আধার! যেভাবে আপনার ক্ষমতা দেখিয়েছেন। ঠিক একইভাবে আমাদের ক্ষমা ও নিরাপত্তা দান করুন।’

দুআ করার সাথে সাথে ঝড় থামা শুরু করল। কমে গেল বাতাসের বেগ, উত্তাল সমুদ্র ধীরে ধীরে শান্ত হলো। নিরাপদ আশ্রয় পেল সবাই। ইবরাহিম বিন আদহাম (রহ.) পুনরায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। আল্লাহর সাথে কি অন্তরঙ্গ যোগাযোগ ছিল তাঁর!

আঠারো

চেতনায় থাক বিষাদের দাগ

أَذْهَبِ الْبُأْسَ رَبَّ النَّاسِ أَشْفِ أَنتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا-

‘হে মানবজাতির শ্রষ্টা! আপনি এ জরা দূর করে দিন, শেফা দান করুন। কেননা, একমাত্র আপনিই শেফা দানকারী। আরোগ্য দানের ক্ষমতা আপনি ছাড়া আর কারও নেই। আমাকে এমন সুস্থতা দান করুন, যাতে কোনো অসুস্থতাই আর অবশিষ্ট না থাকে।’

ওয়াইস কারনি (রহ.)-এর মাতৃভক্তির কথা আমরা অনেকেই জানি। তিনি এমন একজন মানুষ ছিলেন, যার সম্পর্কে রাসূল ﷺ অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ কথা বলেছেন; অথচ তাঁর সাথে কখনোই নবিজির চোখের দেখা হয়নি। রাসূল ﷺ সাহাবিদের যখন ওয়াইস কারনির কথা বলতেন, তখন দুটো বিষয় অবশ্যই উল্লেখ করতেন।

এক

ওয়াইস কারনি কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত ছিলেন। তিনি সর্বদা আল্লাহর কাছে এই রোগ থেকে আরোগ্য লাভের দুআ করতেন। কিন্তু প্রার্থনা করতেন, যেন এমনভাবে আরোগ্য দেওয়া হয়—যাতে তাঁর দেহে এক মুদ্রা পরিমাণ জায়গায় রোগের চিহ্ন থেকে যায়।

দুই

তিনি ছিলেন তাঁর মায়ের খুব অনুগত সন্তান। আর এই আনুগত্য ও শ্রদ্ধার কারণে আল্লাহ তাঁকে অসামান্য মর্যাদায় সম্মানিত করেছিলেন। কেমন ছিল সেই সম্মান? সাহাবিদের প্রতি রাসূল ﷺ-এর পরামর্শ থেকে তা আন্দাজ করা যায়। তিনি সাথিদের বলেছিলেন—কখনো সাক্ষাৎ হলে তাঁরা যেন ওয়াইস কারনিকে তাঁদের জন্য দুআ করতে অনুরোধ করে। এরপর থেকে প্রতি বছর হজে আগত উটের কাফেলাগুলো থামিয়ে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) জিজ্ঞেস করতেন—তাঁরা ইয়েমেন থেকে এসেছেন কি না, সেখানে ওয়াইস কারনি নামের কাওকে চেনেন কি না। খুঁজতে খুঁজতে

একদিন তিনি পেয়েও গেলেন। এই মহান তাবেয়িকে চিনতে পেরে উমর (রা.) নবিজির পরামর্শমাফিক অনুরোধ করলেন, তাঁর জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনার করতে। একবার ভাবুন, রাসূল ﷺ এর জলিলুল কদর সাহাবি উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) দুআ চাইছেন এক ইয়েমেনবাসী মুসাফিরের কাছে। কি অনন্য মর্যাদাই না আল্লাহ দিয়েছিলেন ওয়াইস কারনিকে!

আমরা সাধারণত তাঁর মাতৃভক্তির দিকেই বেশি নজর দিয়ে থাকি। আল্লাহর কাছাকাছি আসতে নিশ্চিতভাবেই পিতা-মাতার আনুগত্য অনিবার্য শর্ত এবং সবচেয়ে মহৎ উপায়। ইবনে আব্বাস (রা.) এ প্রসঙ্গে একবার বলেছিলেন; মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা ব্যতীত এমন কোনো আমলের কথা তিনি জানেন না, যা মানুষকে আল্লাহর অধিকতর নিকটবর্তী করে তোলে। তবে এখন আমরা ওয়াইস কারনির অন্য একটি দিকে দৃষ্টি ফেরাব, সচরাচর যা আড়ালেই থেকে যায়।

কুষ্ঠ রোগ থেকে আরোগ্য প্রার্থনার সময় তিনি চাইতেন, এক মুদ্রা পরিমাণ রোগ যেন তার শরীরে অবশিষ্ট থেকে যায়। সম্পূর্ণ আরোগ্যের বদলে তিনি কেন এমন অদ্ভুত প্রার্থনা করতেন?

আসলে তিনি চাইতেন কৃতজ্ঞ বান্দাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকতে। যেন সব সময় তাঁর মনে থাকে, একসময় তিনি কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত ছিলেন। এই চিহ্ন যেন তাঁকে বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়, আল্লাহ তাঁকে এই রোগ থেকে শেফা দান করেছেন। অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ার আশঙ্কায় তাড়িত হয়েই তিনি মূলত এমন দুআ করতেন।

এই দুআ আমাদের ভাবনার জগতে শক্তিশালী উপাদান হয়ে উঠতে পারে। ভয়াবহ কোনো সমস্যায় পতিত হলে আমরা আল্লাহর কাছে হয়তো মিনতির স্বরে অনুরোধ করি, তিনি যেন আমাদের সম্পূর্ণ বিপদমুক্ত করেন। আর সমস্যা থেকে উত্তরণের পরপরই বেমালুম ভুলে যাই যে, মারাত্মক বিপর্যয়ে নিপতিত ছিলাম। আল্লাহ তাঁর নিজের দয়ায় আমাদের সেখান থেকে উঠিয়ে এনে নিরাপত্তা দান করেছেন। দুআ কবুলের পরক্ষণেই আমরা ভুলতে বসি, ঠিক কেন এবং কী দুআ করেছিলাম। এই কারণেই এই দুআ আমাদের জন্য একটি ব্যতিক্রমী শিক্ষা।

উনিশ

অধিকতর সুন্দর করো, উজ্জ্বল করো হে

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ خَيْرًا مِّمَّا يَظُنُّوْنَ وَاغْفِرْ لِيْ مَا لَا يَعْلَمُوْنَ وَلَا تُؤَاخِذْنِيْ بِمَا يَقُوْلُوْنَ-

‘হে আল্লাহ! মানুষ যা ভাবে, আমাকে তার চেয়ে উত্তম বানিয়ে দাও। লোকে আমার যা জানে না, তার জন্য আমাকে মাফ করে দাও। তারা আমার সম্পর্কে যা কিছু বলে, তার জন্য আমাকে দায়ী করো না।’

মানুষ প্রায়শই আমাদের সম্পর্কে প্রশংসা ও ইতিবাচক মন্তব্য করে থাকে। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে—এই ভালো কথাগুলো সব সময় সত্য না হওয়াও খুব স্বাভাবিক। ধারণাবশত বা অল্প দেখে একজন মানুষ সম্পর্কে খারাপ ভালো যেকোনো মন্তব্য তো খুব সহজেই করা যায়। আর সমস্যাটা সেখানেই। অন্যের বলা ভালো কথা বা প্রশংসার জন্য আল্লাহর সামনে আমাদের জবাবদিহি করতে হবে। কেননা, আল্লাহর সামনে সবকিছুই স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট।

একজন মানুষকে কবরস্থ করার পর আশপাশের লোকেরা যখন তার সম্পর্কে প্রশংসা ও উত্তম সাক্ষ্য দিতে থাকে, ফেরেশতাগণ তখন কবরের মানুষটাকে বিদ্রূপের সুযোগ পেয়ে যায়। তারা জিজ্ঞেস করে—‘তোমার সম্পর্কে লোকে যা বলছে, তা কি আসলেই সত্য? লোকে যেমন বলে, তুমি কি ততটাই ভালো?’ এই ব্যাপারটা অবশ্য সত্যিকার জ্ঞানী বা বুজুর্গদের জন্য প্রযোজ্য নয়; কেননা, মানুষ তাদের ন্যায়পরায়ণতা ও ধার্মিকতার জন্যই চেনে।

নেতিবাচক মন্তব্যের সাথে সাথে আমাদের ধ্বংসাত্মক প্রশংসাকেও অপছন্দ করা উচিত। কারণ, এই সব প্রশংসার জন্য আমরা আল্লাহর কাছে মুনাফিক বলে গণ্য হতে পারি। আবু বকর (রা.) ছিলেন এই ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক। সেজন্য নিজের সৎকর্ম অন্যদের থেকে লুকিয়ে রাখতেন সব সময়। কিন্তু অন্যান্য সাহাবিরা প্রায়ই সেটা বুঝে ফেলতেন। একবার ভাবুন তাহলে, কত আমলই না তিনি করেছেন, মহান আল্লাহই যার একমাত্র সাক্ষী।

দুআর প্রথম অংশে বলা হয়েছে—‘মানুষ আমার সম্পর্কে এমন অনেক কিছুই ভাবতে পারে, যা আদতে সত্য নয়।’ আবু বকর (রা.)-এর দৃষ্টান্ত অনুরূপ। তিনি মনে করেন; লোকজনের এত ব্যাপক সুধারণা ও প্রশংসা তাঁর প্রাপ্য নয়।

বিশ

সবর নহে, প্রার্থনা করো মুক্তি

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَدْعُو يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ تَبَامَ النِّعَةِ. فَقَالَ "أَيُّ شَيْءٍ تَبَامُ النِّعَةِ". قَالَ دَعْوَةٌ دَعَوْتُ بِهَا أَرْجُو بِهَا الْخَيْرَ. قَالَ "فَإِنَّ مِنْ تَبَامِ النِّعَةِ دُخُولَ الْجَنَّةِ وَالْفُوزَ مِنَ النَّارِ". وَسَمِعَ رَجُلًا وَهُوَ يَقُولُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَقَالَ "قَدْ اسْتَجِيبَ لَكَ فَسَلْ". وَسَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصَّبْرَ. فَقَالَ "سَأَلْتَ اللَّهَ الْبَلَاءَ فَسَلْهُ الْعَافِيَةَ".

মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.) বলেন, রাসূল ﷺ একদিন এক লোককে দুআ করতে শুনলেন—
‘হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার দানের পরিপূর্ণতা চাই।’

তিনি জিজ্ঞেস করলেন—

‘দানের পরিপূর্ণতা কী জিনিস?’

লোকটি উত্তর দিলো—

‘এই দুআ আমি বানিয়েছি। এর মাধ্যমে আমি নিজের জন্য কল্যাণ কামনা করি।’

রাসূল ﷺ বললেন—

‘এই ধরনের পরিপূর্ণতার মধ্যে আছে জান্নাতে প্রবেশ এবং জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি।’

এরপর আরেক লোককে বলতে শুনলেন—

‘ইয়া জাল জালালি ওয়াল ইকরাম, অর্থাৎ হে অনন্য মর্যাদা ও মহত্ত্বের মালিক।’

শুনে তিনি বললেন—

‘তোমার কথার জবাব দেওয়া হয়েছে, তুমি যা কিছু চাওয়ার চেয়ে নাও।’

রাসূল ﷺ এরপর আরেক ব্যক্তিকে দুআ করতে দেখলেন—

‘হে আল্লাহ! আমাকে ধৈর্য দাও।’

তিনি বললেন—

‘তুমি তো আল্লাহর কাছে দুঃখ চাইলে; বরং তাঁর কাছে শান্তি ও আরামের জন্য প্রার্থনা করো।’

একটা দৃশ্য কল্পনা করুন। রাসূল ﷺ মসজিদে হেঁটে বেড়াচ্ছেন, কে কী দুআ করছে শুনছেন, আর মন্তব্য করছেন প্রার্থনার ভাষা ও ভঙ্গির ব্যাপারে। এ যেন একজন কুরআন শিক্ষকের মতো; যিনি পুরো মক্তবে হেঁটে হেঁটে দেখেন, অন্যরা ঠিকঠাক তিলাওয়াত করছে কি না।

এখানে শিক্ষণীয় ব্যাপার হলো, আমরা মূলত কী দুআ করব এবং কী করব না। প্রথম ব্যক্তি আল্লাহর কাছে দানের পরিপূর্ণতা চাইছিল। রাসূল ﷺ এই ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন সে উত্তর দিলো, এই দুআ করলে সে ভালো অনুভব করে। তখন রাসূল ﷺ তাঁকে বুঝিয়ে বললেন, দানের পরিপূর্ণতার মধ্যে জান্নাতে প্রবেশ এবং জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তিও অন্তর্ভুক্ত। অতএব, দুআর সময় তার নিয়্যাতের মধ্যে যেন এই প্রার্থনা দুটিও থাকে।

তারপর তিনি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দেখলেন, সে বলছে—

‘ইয়া জাল জালালি ওয়াল ইকরাম, অর্থাৎ হে সম্মান ও মহত্ত্বের মালিক।’

এই শব্দগুলো দিয়ে রাসূল ﷺ নিজে দুআ করতেন। ফলে সেই লোকটিকে বললেন—‘তোমার দুআর উত্তর দেওয়া হয়েছে। অতএব, চাইতে থাকো।’ রাসূল ﷺ বোঝাতে চাইলেন—সে আল্লাহকে ঠিকভাবে সম্বোধন করেছে, যেভাবে রাসূল ﷺ নিজে করে থাকেন। ফলে তাঁকে দুআ এগিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দিলেন। এরপর তিনি একজনকে আল্লাহর নিকট সবার চাইতে শুনলেন। আর রাসূল ﷺ তাঁকে সংশোধন করে দিলেন। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে, মানুষ কি আল্লাহর কাছে সবার চাইতে পারে না? এটা কি ভালো গুণ নয়? লক্ষ করুন, রাসূল ﷺ সেই লোকটিকে বলেছিলেন—

‘তুমি তো আল্লাহর কাছে দুঃখ-কষ্ট চাইলে; বরং তাঁর কাছে সুখ-শান্তি প্রার্থনা করো।’

এই ব্যাপারটিকে আমরা কীভাবে বুঝব? আমরা কি সবারকারী হতে চাই না? রাসূল ﷺ কি আমাদের বলেননি, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের সবার চেয়ে দামি বিস্তৃত কোনো উপহার দেননি? তাহলে রাসূল ﷺ কেন এই লোকটিকে সবার বদলে ‘আফিয়া’ তথা শান্তি ও নিরাপত্তা চাইতে বললেন? মূলত রাসূল ﷺ এখানে একটি বিশেষ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। চলুন সেটি খোলাসা করা যাক।

সবার নিঃসন্দেহে অসাধারণ একটি গুণ। বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করার গুরুত্বও অপরিসীম। কিন্তু মানুষ যখন কোনো দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, সবার বা সহ্য করার শক্তি প্রার্থনার বদলে আমাদের উচিত তখন দুআ করা, যেন আল্লাহ আমাদের যাবতীয় মুসিবত দূর করে দেন।

উনত্রিশ

অন্তর মম নন্দিত করো

اللَّهُمَّ كَمَا حَسَّنْتَ خُلُقِي فَحَسِّنْ خُلُقِي-

‘হে আল্লাহ! অভিরাম চেহারার মতো আপনি আমার চরিত্রকেও সৌষ্ঠবমণ্ডিত করে দিন।’

উম্মে দারদা (রা.) বলেন—

‘আমি আমার স্বামী আবু দারদাকে সারা রাত নামাজ পড়ে সেই একই দুআ করতে দেখলাম, যেটি রাসূল ﷺ নিজেই করতেন—

“হে আল্লাহ! আপনি আমার বাহ্যিক রূপের মতো অন্তরকেও সৌন্দর্যমণ্ডিত করে দিন।”

‘খালক’ অর্থ মানুষের শারীরিক সৌন্দর্য। আর ‘খুলুক’ দ্বারা সাধারণভাবে বোঝানো হয় চরিত্র, যা অবস্থান করে মানুষের হৃদয়ে ও সামগ্রিক আচরণে। কল্পনা করুন তো; আপনার অন্তর এবং চরিত্রের মতো বাইরের দিকটা যদি ঠিক একই রকম হতো, তাহলে কি আয়নায় নিজের মুখ দেখতে পছন্দ করতেন?

কিন্তু প্রশ্ন হলো, আবু দারদা (রা.) সারা রাত নামাজে দাঁড়িয়ে কেন এই বিশেষ দুআটিই করতেন? সকালবেলা উম্মে দারদা (রা.) তাঁর স্বামীকে জিজ্ঞেস করলেন—

‘আপনি আল্লাহর কাছে ভালো চরিত্র ছাড়া আর কিছু চান না কেন?’

তিনি উত্তর দিলেন—

‘হে উম্মে দারদা! একজন মুসলিমের চরিত্র ভালো হলে সে অন্যের সাথে উত্তম আচরণ করে। তখন অন্যরাও তাকে দুআয় শরিক রাখে। এই দুআর কারণে সে প্রবেশ করে জান্নাতে। আর যখন তার চরিত্র মন্দ হয়, সে অন্যের মনে আঘাত দেয়। এটি তার জন্য বয়ে আনে অভিসম্পাত। ফলে সে নিষ্কিণ্ড হয় প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে।’

মানুষের চরিত্র খাঁটি ও আন্তরিক হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি শুধু আল্লাহর সাথে ভালো সম্পর্কেই নির্দেশ করে না; বরং আপনাকে হতে হবে এমন বিশুদ্ধ হৃদয়ের অধিকারী, যেন আপনার সাথে মেলামেশা ও উঠাবসা করা প্রত্যেকেই হাশরের মাঠে ইতিবাচক সাক্ষ্য দেয়।

আবু দুজানা (রা.) যখন অস্তিম শয্যায় শায়িত, তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো—

‘আল্লাহর সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন বিষয়ে আপনি সবচেয়ে বেশি আশাবাদী? আপনি তো আল্লাহর পথের যোদ্ধা ছিলেন, জিহাদ করেছেন রাসূল ﷺ-এর সাথে। একাত্তর নিষ্ঠায় রাসূল ﷺ-কে আগলে রেখেছেন সব সময়। ঢালের মতো ছিলেন বলে আপনার পিঠ ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল তিরের আঘাতে। আজ আল্লাহর রহমতের জন্য নিজের কোন আমল নিয়ে আপনি সবচেয়ে বেশি আশাবাদী?’

তিনি উত্তর দিলেন—

‘এই জিহ্বা কখনোই অন্যকে আঘাত করতে ব্যবহৃত হয়নি। আমি আর কোনো ব্যাপারেই এর চেয়ে বেশি আশাবাদী নই।’

ত্রিশ

দেখাও তোমার সত্য পথ

اللَّهُمَّ ارِنِ الْحَقَّ حَقًّا وَوَفِّقْنِي لِاتِّبَاعِهِ، وَارِنِ الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَوَفِّقْنِي لِاجْتِنَائِهِ-

‘হে আল্লাহ! সত্যকে সত্য জানার শক্তি দিন এবং তা অনুসরণের তাওফিক দিন। মিথ্যাকে মিথ্যা জানার শক্তি দিন আর সক্ষমতা দিন তা এড়িয়ে চলার।’

এ পর্যায়ে প্রশ্ন জাগতেই পারে, সত্য কোনটা? কীভাবে জানব, আল্লাহ আমার কাছ থেকে মূলত কী চান? কতটুকু নিশ্চয়তা দিতে পারি, এই পথ আমাকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাবে?

আপনি সূরা ফাতিহার দিকে তাকালে বুঝবেন, এটি একটি দিক—নির্দেশনামূলক সূরা। মনে হবে যেন সূরা ফাতিহা কুরআনের সমাপ্তি, যেহেতু এটি একটি মোনাজাতের মতো। আল্লাহ এখানে বান্দাকে রবের নিকট একান্ত প্রার্থনার আদব ও পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। এমনটি হতেই পারে না যে, আপনি রবের কাছে আন্তরিকতার সাথে দিনে ১৭ বার সত্য পথের নির্দেশনা প্রার্থনা করবেন আর আল্লাহ আপনাকে নিরাশ করবেন। অবশ্যই আল্লাহ আপনাকে সত্য পথের দিশা দেখাবেন। সুতরাং রবের নিকট হিদায়াতের জন্য দুআ করুন।